সবাই যা দেখে

পঞ্চম শ্রেণীর পাবলিক পরীক্ষার অবসান হোক প্রাথমিক শিক্ষা হোক অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত

আবদুল মান্নান খান

| ঢাকা , বুধবার, ০৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৯

নির্বাচনে বিপুলভাবে বিজয় লাভ করে আওয়ামী লীগ এক নাগাড়ে তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতায় বসেছে। মন্ত্রিসভায় রদবদল এসেছে। শিক্ষামন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী পদে নতুন মুখ এসেছেন। আমরা তাদের অভিনন্দন জানাই। শুরু করা কাজগুলো সমাপ্ত করার প্রতিশ্রুতি এ সরকারের রয়েছে। অনেক বিষয়ে নতুন করে তেমন কিছু ভাবতে হবে না। শিরোনামে যে কাজের কথা বলেছি তাও মন্ত্রণালয়ের কাছে নতুন কিছু না। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা একসময় বাস্তবায়ন করতে গিয়ে থেমে গেল আগের সরকার বা তার আগের সরকার। বলা হলো এর জন্য প্রাইমারি স্কুলের অবকাঠামো ঠিক করতে হবে অর্থাৎ শ্রেণীকক্ষ সেভাবে বাড়াতে হবে। পদ সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। তাদের ট্রেনিং দিতে হবে। কারিকুলাম ঠিক করতে হবে এ রকম আরও কত কি। আরও বলা হলো এগুলো ঠিক করে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত

প্রাথমিক শিক্ষা চালু না হওয়া পর্যন্ত পঞ্চম শ্রেণীতে পাবলিক পরীক্ষা চলবে। পঞ্চম শ্রেণীতে পাবলিক পরীক্ষা ধরে রাখার পক্ষে যুক্তি দেখনো হলো- এতে মেধাবীদের বৃত্তি প্রদান করা সহজ হচ্ছে। বৃত্তি প্রদানের জন্য আলাদা পরীক্ষার নিতে গেলে শ্রেণীর সব শিশু লেখাপড়ায় সমান সুযোগ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। শিক্ষক মহোদয়রা তখন বৃত্তি পরীক্ষার জন্য লেখাপড়ায় ভালো এমন সব ছাত্রছাত্রীদের বাছাই করে নিয়ে পৃথকভাবে বিশেষ যতœ সহকারে পড়ান। এতে করে ক্লাসের অন্যরা বঞ্চিত হয়। কথা দুটোই সঠিকÑ ফলে থেমে গেল দুটো কাজই। এখন পরিবর্তনটা তাহলে কীভাবে আসবে। নাকি কোন পরিবর্তন ছাড়াই এভাবেই আমাদের ছোট ছোট সোনামণিরা নোট-গাইড আর কোচিংয়ের জাঁতাকলে পড়ে পিষ্ট হতে থাকবে। দেশব্যাপী মহাযজ্ঞ চলবে পঞ্চম শ্রেণী পাসের একখানা সনদ হাতে পাওয়ার জন্য যে সনদের বাস্তবে কোন মূল্য নেই। আছে দুর্নীতি বিস্তর। গত পরীক্ষায় দেড় লাখ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেনি বলে খবর ছিল। অথচ এদের বিনা মূল্যে পাঠ্যবই দেয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ অবৈতনিক অবকাঠামোর মধ্যে রেখে তাদের পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত আনতে হয়েছে। অবশ্য তারা যদি পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত আসার আগেই বাদপড়ে থাকে বা শুধু কাগজে-কলমে থেকে থাকে সে কথা আলাদা। পরীক্ষায় না বসা এসব শিক্ষার্থীদের জন্য বিশাল অঙ্কের টাকা ব্যয় করতে হয়েছে সরকারকে। বিনা মূল্যে পাঠ্যবই শুধু না উপবৃত্তির টাকাও দেয়া হয়েছে। এ দেড়

লাখের সবাইকে উপবৃত্তির টাকা দেয়া হয়েছে তা আমি বলছি না। তবে এ কথা তো ঠিক যে গরিব অভিভাবকদের সন্তানরাই তো উপবৃত্তির টাকা পায়। এ টাকা তাদের দেয়া হয় যাতে তারা ঝরে না পড়ে। ঝরে পড়ে কারা? যে অভিভাবকের আর্থিক সমর্থ আছে সে তার সন্তানকে সামনের পাবলিক পরীক্ষায় ব্যর্থ না হওয়া পর্যন্ত এমন কি বারবার ব্যর্থ না হওয়া পর্যন্ত ঝরে যেতে দেবে না কোনভাবেই। প্রয়োজনে আরও শিক্ষক লাগাবেন আরও কোচিং করাবেন। শিক্ষকরাও তাদের ঝরে যেতে দেবেন না তা পড়ালেখা কিছু পারুক আর না পারুক কিছু শিখুক আর না শিখুক। কারণ এর সঙ্গে রয়েছে কোচিং বাণিজ্য রয়েছে নোট-গাইডের বড় অঙ্কের কমিশন। সুতরাং যেসব পরিবারের একটু আর্থিক স্বচ্ছলতা রয়েছে তাদের সন্তানেরা স্কুলপর্যায়ে ঝরে যায় না।

পাবলিক পরীক্ষা অর্থাৎ পিইসির আগে বা পরে তাদের ওই লেখাপড়া কোন কাজে লাগছে না। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সন্তানেরা স্কুলে গিয়ে যাতে লেখাপড়া কিছু শিখতে পারে, খবরের কাগজ-পোস্টার ও দলিল দস্তাবেজগুলো পড়তে পারে যোগ-বিয়োগ গুণ-ভাগ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতেই তো আজ এত আয়োজন এতকিছু। কিন্তু তা কি ঠিক হচ্ছে। দুদিন পর সব ভুলে যাচ্ছে। ভুলে যাতে না যায় তার জন্য যেটুকু করা দরকার তা হলো অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সব শিশুকে টেনে তুলতে হবে বাধ্যতামূলকভাবে। উচ্চশিক্ষার দ্বার সবার জন্য খোলা থাকবে। কিন্তু সবাই উচ্চশিক্ষায় যাবে না যেতে পারেও না। যার মেধা

আছে তাকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে তা সে যে কোন দিকে হোক। যে ছেলেটি বা মেয়েটি লেখাপড়ায় ভালো করছে না কিন্তু দৌড় প্রতিযোগিতায় সে সবার আগে। তাকে তার রাস্তায় এগিয়ে যেতে সহযোগিতা করতে হবে। এর পরও রয়ে যাবে বিরাট একটা জনগোষ্ঠী যাদের ছেলেমেয়েরা প্রথম পাবলিক পরীক্ষাটায় উত্তীর্ণ হয়ে বা না হয়ে ঝরে যাবে। যাচ্ছেও। না হলে চারদিকে এত শিশুশ্রমিক চোখে পড়ে কীভাবে। কথা তাদের নিয়ে। বিনা মূল্যে সবাইকে পাঠ্যবই দেয়া হচ্ছে। উপবৃত্তির আওতায় নিয়ে নগদ টাকা দেয়া হচ্ছে। স্কুলে একটা খাবারও পাচ্ছে যেটা সিমিত এলাকায় শুরু হয়েছে। এখন বিস্কুট দেয়া হচ্ছে আমরা আশা করতে পারি এর সঙ্গে একদিন একটা সিদ্ধ ডিম একটা কলাও দেয়া হবে। তারপরও যারা ঝরে যাচ্ছে বলা যায় তারা কিছু না শিখে বিদায় নিচ্ছে। যেটুক শিখছে বেরিয়ে এসে তা আর মনে থাকছে না। কোন কাজে আসছে না। বলতে চাচ্ছি প্রথম পাবলিক পরীক্ষাটা পঞ্চম শ্রেণীতে অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে এটা হচ্ছে। এই পরীক্ষাটা এমন একটা স্তরে গিয়ে হতে হবে যেখান থেকে আগে-পরে ঝরে গেলেও সব ভুলে যাবে না মস্তিষ্কে কিছু থাকবে। এ জন্য অন্তত অষ্টম শ্রেণী অর্থাৎ জেএসসি পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে সব শিশুকে টেনে তুলতে হবে। যত তাড়াতাড়ি কাজটা করা যাবে তত তাড়াতাড়ি জাতি উপকৃত হবে।

চীন দেশে এ পরীক্ষাটা হয় নবম শ্রেণীতে। পরের পরীক্ষাটা হয় ১২ ক্লাসে গিয়ে। ১২ ক্লাস পর্যন্ত

লেখাপড়া করতে চারবার পাবলিক পরীক্ষায় বসা -এ নিয়ম কোন দেশে আছে বলে আমার জানা নেই। আমাদের কোন বরেণ্য শিক্ষাবিদকেও এ যাবৎ এর স্বপক্ষে কোন কথা বলতে শুনিনি। বরং অনেকে মনে করেন পিইসি এবং এসএসসিÑদুটো পরীক্ষায় তুলে দেয়া উচিত। চীনে নবম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করা সব শিশুর জন্য বাধ্যতামূলক। পরীক্ষাটা নিয়ন্ত্রণ করে এরিয়া অফিসগুলো। আবার সার্টিফিকেট ইস্যু করেন প্রতিষ্ঠানের প্রধান। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলোÑ ওই সনদ হাতে একজন শিক্ষার্থী যখন স্কুল থেকে বের হয় তখন ওই সনদেই উল্লেখ থাকে সনদধারী পরবর্তীতে কী পড়বে বা কী করবে। সে উচ্চশিক্ষায় যাবে না মাঠে কৃষি কাজে যাবে না দোকানের সেলসম্যান হবে। নাকি ধীবর হবে। উচ্চশিক্ষায় গেলে বিজ্ঞান বিভাগে যাবে না কলা শিল্পসাহিত্যে যাবে। নাকি খেলাধুলার লাইনে যাবে। বেশিরভাগ স্কুল আবাসিক করে নেয়ায় কাজটা সহজ হয়েছে বলতে হবে। হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়ে শিক্ষার্থীদের জীবনের দিকনির্দেশনা তারা স্কুল থেকেই দিয়ে দেয়। একজন সুইপারও সনদ ছাড়া কাজ করতে পারে না। যারা শিক্ষক হন তারা শিক্ষকতা লাইনে গ্র্যাজুয়েসন করেই শিক্ষক হন। প্রসঙ্গক্রমে কথাটা বলি। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরাধীন চাকরি করায় একবার শিক্ষা সফরে চীন দেশে গিয়েছিলাম একটা টিমের সদস্য হয়ে। গিয়েছিলাম সে দেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা কেমন তা দেখতে। আমাদের যিনি টিমলিডার ছিলেন তিনি আমাকে

এতদসংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যাপারে একটু বেশি তৎপর হতে দেখে বললেন, আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন। ফিরে গিয়ে আমি তো একটা রিপোর্ট করব। অমুক তো এ ব্যাপারে নোট নিচ্ছেনই। বলেছিলাম আমার একটা উদ্দেশ্য আছে। তখন তিনি বললেন, দেখুন মান্নান সাহেব, ফিরে গিয়ে যত ভালো রিপোর্টই করি না কেন কেউ সে রিপোর্ট কোনদিন পাতা উল্টিয়ে দেখবে না। হয়তো রিপোর্ট জমা দেয়ার আগেই দেখা যাবে আমাকে অন্য মন্ত্রণালয়ে বদলি করা হয়েছে। নতুন প্রকল্প আসবে নতুন বাজেট আসবে আবার এমন টিম কত আসবে-যাবে। কথাটার বাস্তবতা রয়েছে বলতে হবে। তবে আমি আমার কাজ করেছিলাম ধারাবাহিকভাবে যেটা সাপ্তাহিক রোববারে বেরিয়েছিল তখন। এবার ওই বৃত্তি প্রদানের কথায় আসি। মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদানের সুবিধার জন্য দেশব্যাপী পঞ্চম শ্রেণীর সব শিক্ষার্থীকে পাবলিক পরীক্ষায় বসাতে হবে এ কেমন কথা। এ কোন গবেষণার ফসল বলে তো মনে হয় না। অবশ্য গবেষণা করে দেখে সিদ্ধান্ত নেয়ার যে পদ্ধতি তার খুব অভাব রয়েছে আমাদের বলতে হবে। আমি দেখেছি অফিসে কত গবেষণা কর্মকর্তা শুধু নামেই গবেষণা কর্মকর্তা ফাইল ডিল করছেন হয়তো একাউন্টসের।

যাদের মাঠের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রেখে নিরলস গবেষণায় নিমগ্ন থাকার কথা এবং প্রতি বছর সে মোতাবেক লেখাপড়ায় সময়োপযোগী সংযোজন-বিয়োজন আসার কথা সেই এনসিটিবি

প্রতি বছর বিরাট এক কর্মযজ্ঞে ন্যাস্ত। কোটি কোটি পাঠ্যপুস্তক ছাপানো এবং বিতরণের কাজ প্রশংসনীয়ভাবে করে যাচ্ছেন তারা প্রতি বছর। কাজেই তাদের কাছে এর বেশি আর কত আশা করা যেতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের রয়েছে বিরাট এক নেটওয়ার্ক রুট লেভেল পর্যন্ত। তারা শিক্ষক নিয়োগ-বদলি তদারকি বেতনাদি ছাড়াও শিক্ষকদের ছুটিছাটা নানা কাজে ন্যাস্ত। শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য কাজ করে যাচ্ছে নেপ (ন্যাশনাল একাডেমি ফর প্রাইমারি অ্যাডুকেশন)। তাহলে গবেষণাটা কোথায় হচ্ছে। মেধাবীদের বৃত্তি প্রদানের জন্য দেশব্যাপী পাবলিক পরীক্ষা না নিয়ে অন্য উপায় বের করতে হলে তো গবেষণার প্রয়োজন। যে চীন দেশের কথা বললাম সেখানে আমাদের বলা হয়েছিল, ৩০০ গবেষণা কর্মকর্তা নিযুক্ত রয়েছে শুধু প্রাইমারি শিক্ষার গবেষণার জন্য। প্রতি বছর সেখানে কারিকুলাম নিয়ম-নীতি সংযোজন-বিয়োজন করছে তারা। এটা ২০০৩ সালের কথা বলছি। একটা শ্রেণীর সব ছাত্রছাত্রী সমানভাবে ভালো করবে এ আশা কেউ করে না। করতে পারে না। সুযোগ-সুবিধা থাকার কারণে হোক অথবা যে কারণেই হোক যারা পড়ালেখায় ভালো করে তাদের প্রতি শিক্ষকদের নজর একটু পড়েই। তার মানে এই না যে অন্য ছাত্রছাত্রীদের প্রতি তারা নজর দেন না। একজন শিক্ষক যখন শ্রেণীকক্ষে পড়ান তিনি জানেন উপস্থিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে কে কে পড়াটা পারবে। তাদের বাদ রেখে বরং অন্যদের পড়তে বলেন পড়া

ধরেন। তাদের খাতাটা আগে দেখেন। এটা যদি না করেন কোন শিক্ষক সেটা তার ব্যক্তিগত গাফিলতির ব্যাপার শুধু না সেটা তার অযোগ্যতাও বটে। যে চীন দেশের কথা বললাম সেখানে একবারে কোন শিক্ষক চাকরিতে নিয়মিত হয় না। তাকে দুটো ধাপ পাড়ি দিয়ে নিয়মিত হতে হয় যার মধ্যে এসব বিষয় থাকে।

শিক্ষকরা হাতেখড়ির থেকে শুরু করে একটা শিশুশিক্ষার্থীকে যখন পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত আনেন তখন ওই শিক্ষকদের থেকে ওই শিক্ষার্থীর মেধা সম্পর্কে আর কে ভালো জানতে পারেন! অথচ ওই প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকের দেয়া সনদের কোন মূল্য নেই। ওই সনদটা হাতে নিয়ে শিক্ষকের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে গিয়ে একজন শিক্ষার্থী হাইস্কুলে গিয়ে ভর্তি হতে পারছে না। পিইসি পরীক্ষায় কত নম্বর পেল সেটা বিষয়। এমনও হতে পারতো একজন ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থী বৃত্তি পাবে তার বর্তমান পারফরমেন্সের জন্য। অতীত রেকর্ড থাকবে তার সঙ্গে যুক্ত হবে বর্তমান পারফরমেন্স। হতে পারে সেটা ৫০-৫০। বাজেট সমস্যা হলে সেটা এক মন্ত্রণালয় আরেক মন্ত্রণালয়কে স্থানান্তর করে দিয়েও হতে পারে। আবার এমনও হতে পারে (সোদা চোখে আমরা যেটা দেখি বা ভাবি) পঞ্চম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষাটা উপজেলা/থানাভিত্তিক গ্রহণ করা যেতে পারে। পঞ্চম শ্রেণীর সব পরীক্ষার্থী সেখানে পরীক্ষা দেবে। যারা ভালো করবে তারা বৃত্তি পাবে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি এবং পরীক্ষার আয়োজন করবে এ লক্ষ্যে গঠিত

উপজেলা/থানার বিশেষ কাম্যটি। তাহলেও তো বিষয়টা নিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে দক্ষযজ্ঞ সৃষ্টি হবে না। যাকে আমরা বিকেন্দ্রীকরণ বলি সেটা হবে। এর পর স্ব স্ব স্কুলের শিক্ষক মহোদয়রা প্রশ্নপত্র নিজেরা তৈরি করে পরীক্ষা নেবেন চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত। প্রশ্ন ব্যাংকেরও দরকার নেই প্রশ্নপত্র কেনাবেচারও দরকার নেই। প্রশ্ন তৈরি করতে সৃজনশীলতার যে ভীতি তারও দরকার নেই। শিক্ষক মহোদয়রা যা পড়াবেন যেভাবে পড়াবেন প্রশ্নপত্র সেভাবে করবেন। বিরাট একটা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চাকরিতে আসা সরকারি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকরা এটা পারবেন না এ কথা বিশ্বাস করা যায় না। দায়িত্ব পেলে ঠিকই পারবেন। সমস্যাটা হলো আমি মনে করি ওই পঞ্চম শ্রেণীতে পাবলিক পরীক্ষা। ভয়টা ধরেছে ওখানে। জিপিএ-৫, গোল্ডেন ছুটে গেলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার এমনই প্রচার শিশুদের ওপর পাথরের মতো চেপে বসেছে। আর এর সঙ্গে দুর্নীতির কথা আর নাই বা বললাম।

প্রাথমিক শিক্ষা হোক অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক এবং সেখানেই অনুষ্ঠিত হোক প্রথম পাবলিক পরীক্ষা। আর পঞ্চম শ্রেণী থেকে পাবলিক পরীক্ষার অবসান হোক। বিগত সরকারের প্রাথমিক শিক্ষার মাননীয় মন্ত্রী একাধিকবার এ পরীক্ষাটা তুলে দেয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন। এবার আমরা তার বাস্তবায়ন দেখতে চাই।